গোবিন্দদাসের কড়চা-রহস্য

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ

প্রণীত

১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩ সাল।

প্রকাশক—
শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষ।
২নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন,
কলিকাতা।

মূল্য—আট আনা

প্রিণ্টার—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত
"নলিনী-প্রেস"
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সূচীপত্র

গোবিন্দদাসের করচা-রহস্য

আরম্ভ

শান্তিপুরনিবাসী ও স্থানীয় মিউনিসিপাল হাইস্কুলের তৎকালীন প্রধান পণ্ডিত স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় "গোবিন্দদাসের করচা" নামক একখানি কবিতা পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারীর অধ্যক্ষদিগকে প্রকাশের জন্য প্রদান করেন। এই পুস্তক তাঁহাদিগের দ্বারা ১৮৯৫ সালে মুদ্রিত হয়। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে, গোস্বামী মহাশয় ইহার একখানি সমালোচনার্থে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে প্রদান করেন। স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় ইহার একটী বিস্তৃত সমালোচনা লিখিয়া ঐ সনের কার্ত্তিক মাসের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

মতিবাবুর অভিমত

মতিবাবু প্রথমে এই পুস্তকের সরল ভাষার, সুন্দর কবিতার এবং চমৎকার বর্ণনার অশেষ প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলেন—

"শ্রীল জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় গোবিন্দদাসের করচা নামক যে পুস্তক ছাপিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ যে অলীক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অলীক অংশ গোড়ার ৫০ পাতা। যেরূপে এই অলীক অংশ ছাপার

পুস্তকে প্রবেশ করিয়াছে তাহা বলিতেছি। এই করচার সমগ্র হস্তলিখিত পুথি কেবলমাত্র শ্রীল জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছিল। উহার প্রথম হইতে রায় রামানন্দের সহিত মিলন পর্য্যন্ত অংশ রাণাঘাটের বাবু যজ্ঞেশ্বর ঘোষ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আমার অগ্রজ পূজ্যপাদ শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে অর্পণ করেন। তিনি ঐ পাতাগুলি পাইবামাত্র পাঠ করেন এবং ইহা পাঠে এত বিমোহিত হন যে, বারম্বার পাঠ করিয়া উহার স্থূল ও সূক্ষ্ম কাহিনী সমূহ একরূপ কণ্ঠস্থ করেন এবং শেষে এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় লিখেন। হস্তলিখিত পাতাগুলি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে ফেরত দেওয়া হয়, এবং আমাদের যতদূর স্মরণ আছে তিনি উহা "রেইস্ ও রায়ত" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে উহা ফেরত পাওয়া যায় না। এইরূপে আদিম করচার গোড়ার পাতাগুলি নষ্ট হইয়া যায়।

"এই ঘটনার পর গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমার অগ্রজ মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। তিনি করচার অবশিষ্টাংশ—অর্থাৎ রায় রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন হইতে শেষ পর্য্যন্ত—অগ্রজ মহাশয়কে অর্পণ করেন। তিনি এই অংশ অবিলম্বে নকল করিয়া রাখেন। [এই নকল খাতা অদ্যাপি আমাদের ঘরে আছে।]

"যে পাতাগুলি হারাইয়া যায়, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয় এবং উভয়েই সে জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবে তাঁহারা আশা করেন যে, এই নষ্ট অংশ কাহারও না কাহারও হস্তগত হইয়া থাকিবে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ উহা নকল করিয়া রাখিতে পারেন। সুতরাং এইরূপে উহা পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারিবে। গোস্বামী মহাশয় এরূপ আশাও করিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহাদের ঘরে এই গ্রন্থ রহিয়াছে,

তখন উহার নকল কোন আখড়া বা বৈষ্ণব-গৃহে থাকিবার সম্ভাবনা। যাহাহোক শেষে এইরূপ সাব্যস্ত হয় যে, করচাখানি ছাপান কর্ত্তব্য। তবে নষ্ট পাতাগুলি পাওয়া যায় ভালই, নচেৎ উহা বাদ দিয়াই ছাপা হইবে। তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ ঐ অংশে যে সকল প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ ছিল তাহা অগ্রজ মহাশয়ের কণ্ঠস্থ আছে এবং উহার কতকগুলি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ও শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"গোবিন্দদাসের করচা ছাপিবার বন্দোবস্ত করিয়া গোস্বামী মহাশয় একদিন আমাদিগকে দর্শন দিয়া বলেন যে, হারাণো কয়েকটি পাতার নকল তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু তিনি ঠিক বলিতে পারেন না ঐ নকল অংশ অলীক কি না। তবে তাঁহার বাসনা, গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত না হয়। এই নিমিত্ত তিনি ঐ নকল অংশ সহ পুস্তকখানি ছাপিতে সংকল্প করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, নকলটি যদি প্রকৃতই অলীক হয় তবে উহা প্রকাশিত হইলে কোন না কোন ব্যক্তি এই ভুল ধরিয়া দিবেন, এবং এইরূপে আসলটুকু হয়ত বাহির হইয়া পড়িবে। এই প্রকারে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার পুস্তকে ঐ নকল অংশের স্থান দেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ঐ নকল অংশ সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত। সুতরাং গোস্বামী মহাশয়ের উদ্দেশ্য ত সুসিদ্ধ হয়ই নাই, অধিকন্তু ঐ নকল অংশ ছাপার পুস্তকে প্রকাশিত হওয়ায় সমস্ত করচাখানি অবিশ্বাস্য হইবার সম্ভবনা হইয়াছে।"

ইহার পর পাণ্ডুলিপির নষ্টপত্র গুলির সহিত মুদ্রিত পুস্তকের ঐ অংশের যে সকল স্থানে মিল নাই সমালোচক মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন। সেই গুলি আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

(ক) নষ্টপাতা গুলিতে ছিল—গোবিন্দ কায়স্থ, বেশ লিখিতে

পারিতেন, সংস্কৃত ভাষায় তাহার বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু মুদ্রিত-পুস্তকে আছে,—তিনি কর্ম্মকার, হাতাবেড়ি গড়া তাহার জাত-ব্যবসা।

(খ) নষ্টপাতায় ছিল—গোবিন্দের স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে তাহার পুত্রবধু সংসারের কর্ত্রী হন। একে গৃহশূন্য হওয়ায় তিনি সংসারে আর সুখ পান না, তাহার উপর পুত্রবধু তাঁহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। পুত্রকে জানাইয়া কোন ফল না হওয়ায় গোবিন্দ সংসার ত্যাগ করেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে আছে—গোবিন্দের স্ত্রী শশীমুখী স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহাকে নির্গুণ মূর্খ বলিয়া গালি দেন, এবং সেই অপমানে গোবিন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

(গ) নষ্টপাতা গুলিতে এক রজকের কাহিনী ছিল। গোবিন্দের করচা মুদ্রিত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে শিশিরবাবু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় "প্রভু ও রজক" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে আছে—"শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইয়া গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া যখন নীলাচল অভিমুখে চলিলেন, তখন তিনি অসীম শক্তির সহায়তা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। কারণ তখন দ্রুতগতিতে কার্য্য না করিলে চলে না। এইস্থানে এই সময়কার একটি কাহিনী বলিব। এটী গোবিন্দ তাঁহার করচায় বলিয়াছেন। এই গোবিন্দ প্রভুর ভৃত্য, তিনি নীলাচলে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন।" ইহাই বলিয়া মহাত্মা শিশিরকুমার করচা হইতে রজকের কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু ছাপার করচায় এই রজকের কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই।

এতদ্ভিন্ন করচায় এরূপ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা অপর কোন গ্রন্থে নাই। যেমন—

করচায় আছে—সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু শান্তিপুর হইয়া বর্দ্ধমানে গেলেন। তারপর দামোদর পার হইয়া হাজিপুর, নারায়ণগড়, জলেশ্বর,

প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া সুবর্ণরেখার তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিলেন—ঈশান, প্রতাপ, গঙ্গাদাস, গদাধর ও গোবিন্দ। কিন্তু শান্তিপুর হইতে বাহির হইবার পর হইতে পুরী পৌছান পর্য্যন্ত সঙ্গীদিগের মধ্যে একমাত্র গোবিন্দ ভিন্ন অপর কাহারও নামের উল্লেখ করচায় নাই।

করচায় আছে—প্রভু বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের পথে পুরী গিয়াছিলেন। প্রভুর এই পুরীযাত্রা কাহিনী এবং সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁহার সঙ্গীদিগের চরিত্র করচায় কি ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, এখন তাহাই দেখাইতেছি। গোবিন্দ কর্ম্মকার করচায় বলিতেছেন—

"বর্দ্ধমানে যখন পৌঁছিনু মোরা সবে।
ভাবিতে লাগিনু মুহি ভাগ্যে কিবা হবে ॥
তখন—মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রভু কহে।
চল যাই গোবিন্দরে তোমাদের গৃহে ॥
এই কথা শুনি মুহি উঠিনু চমকি।
হাসিয়া চলিল প্রভু ঠমকি ঠমকি ॥"

এখানে একটি কথা ভাবিবার আছে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ভাবে বিভোর হইলেন এবং কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিলেন। নিত্যানন্দ অনেক কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুর অদ্বৈতগৃহে লইয়া আসিলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া এবং জননী ও ভক্তগণকে কৃপা করিয়া প্রভু একদিন হঠাৎ তথা হইতে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন প্রভুর মনের ভাব এইরূপ, তখন তিনি নীলাচলের পথ ছাড়িয়া কাঞ্চননগরে গোবিন্দের গৃহে চলিলেন, এবং কি ভাবে চলিলেন তাহা করচা হইতে উদ্ধৃত উল্লিখিত পয়ারগুলিতে প্রকাশ। এইরূপে প্রভুর চরিত্র সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া গ্রন্থকার প্রভুর প্রতি পাঠকের

ভক্তিশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিলেন, না তাঁহার প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করিলেন ?—ইহাই এখন ভাবিবার বিষয়।

তারপর শুনুন। প্রভু গোবিন্দের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করিতে করিতে "ঠমকি ঠমকি" চলিয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দের স্ত্রী শশিমুখী হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, আর স্বামীকে দেখিয়া—

"কাঁদিয়া আকুল বামা চারিদিকে চায়।
তখন—তত্ত্বকথা বলি প্রভু তাহারে বুঝায়॥"

আমরা প্রভুর লীলাগ্রন্থে দেখিতে পাই, প্রভু যখনই যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রূপ, সনাতন, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নাম কে না জানেন ? সেই প্রভুকে শশিমুখীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল! প্রভু নানাপ্রকার তত্ত্বকথা বলিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই সকল উপদেশ শশিমুখীর হৃদয় স্পর্শ করিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া—

"প্রভু কহে—গোবিন্দ রে গৃহে থাক তুমি।
অন্য ভৃত্য সঙ্গে করি পুরী যাই আমি॥"

অর্থাৎ প্রভু যখন দেখিলেন যে, শশিমুখী কিছুতেই নিরস্ত হইল না, সে গোবিন্দকে পাকড়াও করিয়া লইয়া যাইয়া তাহাকে আবার পচাগৃহস্থ না সাজাইয়া কিছুতেই ছাড়িবে না, তখন প্রভু আর কি করেন ? তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া গোবিন্দকে বলিলেন,—"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। কাজেই তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া যাওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।" এই কথা বলিয়া ও শশিমুখীর হাতে গোবিন্দকে সঁপিয়া দিয়া, প্রভু সেই স্থান হইতে সরিয়া

পড়িলেন। প্রভুর অনেক পথ যাইতে হইবে, কাজেই একজন ভৃত্যের আবশ্যক ত বটেই, নচেৎ দণ্ডকমণ্ডলু বহির্বাসাদি বহিয়া লইয়া কে যাইবে। করচা-লেখক এইভাবে প্রভুর মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। যিনি দক্ষিণদেশে যাইবার সময় প্রথমে কোন লোক সঙ্গে লইতেই রাজী হন নাই, তিনিই বলিতেছেন,—"গোবিন্দ ঘরে যাও, আমি না হয় অন্য ভৃত্য সঙ্গে লইয়া যাইব।" এই কথা যিনি প্রভুর মুখ দিয়া বাহির করিলেন, তিনি কি না হইলেন প্রভুগত-প্রাণ! করচা-লেখক হয় ত তখন গোঁসাঞী ঠাকুরের ভৃত্যসঙ্গে প্রবাসে যাইবার কথা ভাবিতেছিলেন।

যাহাহোক প্রভু ত সরিয়া পড়িলেন। তখন গোবিন্দ নিরুপায় হইয়া ইতিউতি চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই সময় এক অঘটন ঘটিয়া গেল,—সেই হাতাবেড়ি গড়া মূর্খ গোবিন্দকামারের মুখ দিয়া হঠাৎ নিগূঢ় তত্ত্বকথা, অনর্গল বাহির হইতে লাগিল! আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রভুর তত্ত্বকথা যে শশিমুখীর মনের উপর কোনরূপ চাপ দিতে পারে নাই, গোবিন্দকামারের বদননিঃসৃত তত্ত্বকথা কেবলমাত্র সেই শশিমুখীকেই নহে, উপস্থিত সকলকেই এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, গোবিন্দ তখন অবলীলাক্রমে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন,—কেহই তাঁহাকে বাধা দিল না! তখন তিনি দ্রুতপদে দামোদরের তীরে যাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

গোবিন্দের এই কার্য্য যে এক অলৌকিক ব্যাপার তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; এবং দীনেশবাবু যদিও বলিয়াছেন যে, "এ সকল অলৌকিক ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করা ভাবরাজ্যের কথা", তবুও এই অলৌকিক ঘটনা যখন গোবিন্দদাসের করচায় প্রকাশিত হইয়াছে, তখন ইহা মানিয়া লওয়া ভিন্ন তাঁহার আর কোন উপায় নাই।

যাহাহোক ক্রমে দামোদর পার হইয়া তাঁহারা কাশীমিত্রের বাড়ী

উপস্থিত হইলেন। কাশীমিত্র অত্যন্ত ধার্ম্মিক লোক। অতিথি সন্ন্যাসী দেখিয়াই তিনি ভোগ লাগাইবার জন্য ভাল সরু চাউল আনাইয়া দিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই চিকনিয়া চাউলের নাম কি ?" মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"জগন্নাথভোগ।" চাউলের নাম শুনিয়াই প্রভুর দুই চক্ষু দিয়া অজস্র প্রেমধারা বহিতে লাগিল। তখন প্রভু—

"কাঁদিতে কাঁদিতে বলে,—হা হা জগন্নাথ।
শীঘ্র টানিয়া মোরে লহ তব সাথ ॥"

কিন্তু প্রভুর এই ভাব অধিকক্ষণ রহিল না, তখনই তাঁহাকে ইহা সম্বরণ করিতে হইল। কারণ তিনি দেখিলেন যে, গোবিন্দ ক্ষুধার জ্বালায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিলেন, এবং পাকা পাচকের ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শুক্তার ঝোল, বেতো শাকের সূপ, গুড় দিয়া চুকাম্ল, করলা ভাজা প্রভৃতি বিবিধ ব্যঞ্জন পাকাইলেন। গোবিন্দ বলিতেছে—

"বেতো শাকের গন্ধে দিক আমোদ করিল।
ভোগ না হইতে মন চঞ্চল হইল ॥"

গোবিন্দের ভাবগতিক দেখিয়া প্রভু মধুর ভাষে তাহাকে বলিলেন—

"বড় ক্ষুধা হইয়াছে বাছনি তোমার।
ইতিউতি চাহিতেছ তাই শত বার ॥

তারপর—প্রভু কহে তুলসী আনহ শীঘ্র করি।
ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ দিব প্রাণভরি ॥"

গোবিন্দের আর সবুর সহিল না। তিনি তাড়াতাড়ি পাতা পাতিয়া বসিলেন।

আর প্রভু—"ভোগ দিয়া প্রসাদ বন্টন করি দিলা।

হুঙ্কার ঝোলে প্রাণ প্রসন্ন হইল ॥

আটখানা কয়লার ভাজি খাই সুখে।

বড় বড় গেরাস তুলিয়া দেই মুখে ॥

চুকায় গুড় দিয়া অমৃত সমান।

কত খাব, আনন্দেতে প্রসন্ন বয়ান ॥"

এই বর্ণনা দ্বারা বেশ বোঝা যাইতেছে, গোবিন্দ কি জন্য প্রভুর এরূপ অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। যাহাহৌক প্রভু প্রথমে গোবিন্দের পেটের জ্বালা জুড়াইয়া তারপর নিজে ধীরে সুস্থে সেবায় বসিলেন, অথবা গোবিন্দের সঙ্গেই একত্রে বসিয়া গেলেন, সে সংবাদটি গোবিন্দ দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিম্বা লজ্জার খাতিরে ইচ্ছা করিয়াই দেন নাই, তাহা বলা বড় সহজ নহে। যাহাহৌক আহারাদির পরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ন সময়ে গোরাচাঁদ দক্ষিণদিকে ছুটিয়া চলিলেন। ক্রমে তাঁহারা হাজিপুরে যাইয়া পৌঁছিলেন এবং গ্রামের বাহিরে মাঠের মধ্যে এক প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষতলে যাইয়া বসিলেন। বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তন সুরু হইল। হরিধ্বনি শুনিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে বহু নরনারী ও বালকবালিকার আগমনে সেই স্থান ভরিয়া গেল। তখন—

"নাচিতে লাগিলা প্রভু মাতাইয়া দেশ।

কোথায় কৌপীন ডোর আলুথালু বেশ ॥

আছাড় খাইয়া প্রভু পড়য়ে ধরায়।

মুখে লালা ইতিউতি গড়াগড়ি যায় ॥"

এই ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর গত হইল। ক্রমে সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কাজেই তখন কীর্ত্তন থামিয়া গেল। কীর্ত্তন বন্ধ হইবার আরও এক কারণ হইতে পারে। হয়ত এতক্ষণ